ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 121-129
www.athenajournalcbm.in

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধ ভাবনা

ভবেশ মজুমদার*

প্রাপ্ত: ২৩.০২.২০২৪ পরিমার্জন: ০৮.০৫.২০২৪ গৃহীত: ১১.০৬.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *মঙ্গলকাব্যে যুদ্ধ-বর্ণনা একটি সাধারণ রীতি। কয়েকটি যুদ্ধ-চিত্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লক্ষণীয়। কবিরা যুদ্ধ-সজ্জা ও যুদ্ধ-বর্ণনায় যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কালকেতুর অতুলনীয় বীরত্ব ও শক্তিমত্ততার পরিচয় দিয়েছেন তারা। একই সঙ্গে দেখিয়েছেন দৈবীমহিমা। অমিতবীর্য কালকেতু একবারই পরাজিত হয়েছে এবং তা দেবী চণ্ডীর ইচ্ছাতেই। কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয়ে গতানুগতিক রীতিতে যুদ্ধ-বর্ণনা করলেও কবিরা কোথাও যে মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।*

সূচক শব্দ: *বিক্রম, রক্ত, রণক্ষেত্র, সৈন্য, কৌশল, বিপদ, ক্রন্দন, দৈবীমহিমা।*

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: majumderbhabesh458@gmail.com

বাঙালি কোনো কালেই যুদ্ধ-উন্মাদ জাতি নয় এবং সেই পরিচিতিও তার নেই। বাংলার মানুষের যুদ্ধভীতিও নেই। বরং বীরের প্রতি আছে এক প্রচ্ছন্ন অনুরাগ। মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে যুদ্ধের রমরমা দেখা যায়। যুদ্ধের বিস্তৃত পরিসর ও বর্ণনা রয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিতে। এমনকি শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও। আঠারো পুরাণ ও উপপুরাণগুলিতে একই সঙ্গে দেখা যায় যুদ্ধ ও শান্তির সহাবস্থান। মনে হয় এই ঐতিহ্যই মঙ্গলকাব্যগুলিকে প্রভাবিত করেছিল। সঙ্গত কারণেই যুদ্ধ-বর্ণনা হয়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধ-বর্ণনার সাদৃশ্যে মঙ্গলকাব্যগুলিতে যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধ-বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে বলেছেন— "কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতে যে অতিরঞ্জনপ্রবণতা ও অতিপ্রাকৃত ঘটনাসংস্থান যুদ্ধবর্ণনার প্রধান অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সমস্ত পরবর্তী সাহিত্য সেই প্রথারই জের টানিয়া চলিয়াছে।"[১]

যুদ্ধ মানেই যুদ্ধভেরীর সিংহনাদ, রণদামামা, শঙ্খনিনাদের সঙ্গে হাজার হাজার সৈন্য, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদির সমাহার। দেখা যায় অগুনতি অশ্ব, হস্তী ও রথের ব্যবহার। অস্ত্র হিসাবে শূল, বজ্র, তীর-ধনুক, খড়্গ, অসি থাকলেও সেখানে অনাদৃত নয় ইট-পাটকেলও। কখনো গালাগালি, কখনো হাতাহাতি, কখনো কাটাকাটি— সব মিলিয়ে এক বিভীষিকাময় আবহ নির্মাণের প্রচেষ্টা।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কয়েকটি যুদ্ধের বর্ণনা আছে। কবিরা এতে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সেই যুদ্ধ-বর্ণনা ও যুদ্ধসজ্জা কাব্যে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা আমাদের আলোচনার বিষয়।

কালকেতুর প্রথম যুদ্ধযাত্রা

কালকেতুর অত্যাচারে বনের পশুদের জীবন দুর্বিষহ। ব্যাধের সন্তান কালকেতু জীবিকা অর্জনের জন্য নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে বন্য জন্তু-জানোয়ার। এই সব দুর্দান্ত শ্বাপদদের এমন কোনো শক্তি নেই যার দ্বারা তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। তারা প্রাণভয়ে ভীত। উপদ্রুত পশুরা আবেদন জানালে তাদের সঙ্গে অরণ্যের পশুরাজ সিংহ কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। একদিকে অমিত মনুষ্যশক্তি, অন্যদিকে দুরন্ত হিংস্র পাশবশক্তি। এই দুইয়ের বিকট যুদ্ধে ঢাল-তরোয়াল, দগড় কিংবা অন্য কোনো অস্ত্রের ঝনঝনি নেই, শুধু রয়েছে শারীরিক শক্তির মরণপণ পরীক্ষা।

কালকেতুর প্রথম যুদ্ধযাত্রায় দেখা যায় সকালে উঠেই কালকেতু মৃগয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বীরধড়া পরিধান, তীরধনুক গ্রহণ, রাঙা-ধূলি মেখে অঙ্গের বেশ ধারণ, জালদড়ি বেঁধে কেশরঞ্জন ইত্যাদি কাজগুলি করছে। তারপর মহাবীর দেবী চণ্ডীর চরণে প্রণাম করে শুভক্ষণে বনে প্রবেশ করে। কালকেতুকে দেখেই তাকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে বাঘ। লাফ দিয়ে সে কালকেতুর ধনুক ধরে ফেলে। বজ্রমুষ্টি দিয়ে কালকেতু মাথায় আঘাত করলে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হতে থাকে বাঘের মুখ থেকে। যুদ্ধে বাঘ পরাজিত এবং পশুরাজ সেই সংবাদ পেল।

বাঘা পড়িল রণে বড় পাল্য শোক।
রাজা-স্থানে বার্তা দিতে চলিলেন কোক॥[২]

পশুরাজের যুদ্ধে গমন

কালকেতুর হাতে বাঘের নিহত হবার সংবাদ চরমুখে শুনে পশুরাজ সিংহ যুদ্ধে গমন করল, কিন্তু কালকেতুর সঙ্গে পেরে না উঠে রণে ভঙ্গ দিল। ধারালো টাঙ্গি দিয়ে মহাবীর হাতির শুঁড় কেটে ফেলল। অসাধারণ একটি উপমা দিয়ে কবি লিখলেন—

গৃহস্থে যেমন কাটে ক্ষেতে ইক্ষুদণ্ড।[৩]

যুদ্ধে বাঘের পর হাতির পতন হল। একে একে তার সব পশুসৈন্যর একই দশা হল এবং তা চোখের সামনে দেখল পশুরাজ। তারপরই পশুরাজ ঝড়ের গতিতে কালকেতুকে আক্রমণ করল। নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করল কালকেতুর দেহ। তার সারা শরীর বেয়ে রক্ত ঝরছে। অকস্মাৎ কালকেতু পশুরাজের মুখে বজ্রমুটকি মারলে তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে। তারপরই মহাবীরের ধনুকের বাড়ি খেয়ে পশুরাজ রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

ধনুকের বাড়ি খায়্যা সিংহ নাহি ফিরে।
লেঙ্গুড় লুটায় তার অবনী উপরে॥[৪]

পশুরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ

কালকেতুর বিরুদ্ধে পশুরাজ নতুন উদ্যমে যুদ্ধ-প্রস্তুতি নিলে কালকেতুও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। কটি-বসন পরে খর-তীক্ষ্ণ তিনটি বাণ নিল কালকেতু। মাথায় জালের দড়ি। কানে ফটিকের কড়ি। তারপরই সে প্রবেশ করল বনে। সিংহ সেই সংবাদ পেয়ে কোপে জ্বলতে লাগল এবং মহাবীরের পথ আগলে বসল। সিংহের সঙ্গে কালকেতুর শুরু হল প্রবল যুদ্ধ।

দুই জনে করে মহারণ॥[৫]

সিংহের গর্জনে পশুরা ভয় পেল। শক্তিতে কেউ কারো থেকে কম নয়। কালকেতু কোনো অস্ত্রেই তাকে ঘায়েল করতে পারছে না। কবি মুকুন্দ সিংহের বিক্রমের জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। রণংদেহী সিংহের হা-করা মুখ যেন পর্বতগুহা, নখ যেন চোখা-ছুরি, দাঁতের কড়মড় যেন ঢাকের বাড়ির শব্দ, চোখ হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল, কেশরগুলি কাঁপছে উন্মত্ত হয়ে, আর নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ে ফেলছে। কালকেতু মল্লযোদ্ধার মতো গোঁফে পাক দিয়ে, দাঁত দিয়ে অধর চেপে পশুরাজকে বাধা দিল। কালকেতু 'মার' 'মার' ডাক পেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। বাটুল নিক্ষেপ করল ঘন ঘন। তা দেখে পশুরাজও লাফ দিয়ে কালকেতুর বুকে চাপড় দিতে উদ্যত হল। ক্রোধে কালকেতু সিংহের লেজ ধরে তাকে চাকের মতো ঘোরালো। সিংহ বলশালী হলেও কালকেতুর শক্তির কাছে হল পরাভূত। মহাবীর তাকে তুলে মাটিতে আছাড় মারল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী কালকেতুর শক্তিমত্ততার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে—

গগনে উঠিয়া লাফে বীরেরে কেশরী ঝাঁপে
হানিতে চাপড় চাহে বুকে।
উঠিয়া মহিষা চালে সিংহেরে হানিল ভালে
দারুণ মুটকি মারে মুখে॥....
বীর অতি কোপে যুঝে ধরিল সিংহের লেজে
বিষধরে গরুড় যেমন॥
লেজে ধরি দেয় পাক সিংহ যেন ঘোরে চাক
তথাপি সিংহের বড় বল।
তুলিয়া আছাড়ে ভূঞে শোণিত নিকলে মঞে
দুই অঙ্গে বহে ঘর্মজল॥[৬]

কালকেতু ধনুকের বাড়ি মারল পশুরাজের পিঠে এবং তা দেখে তাড়াতাড়ি গর্তের ভিতরে ঢুকে পড়ল ভালুক। কালকেতু যেভাবে পশুরাজকে পাক দিয়ে মাটিতে আছাড় মারে তা দেখে শরভ পালিয়ে গেল। কিন্তু পালানোর পথে কালকেতু তাকে ধরে পাক দিয়ে আছাড় মারল। লেজ তুলে মুখ মেলে বাঘ দৌড়ে এলে টাঙ্গি দিয়ে বীর তার দাঁত ভেঙে দিল এবং লেজ ধরে পাক দিল। পশুরা পরাজিত কালকেতুর বিক্রমের কাছে। তারা রণে ভঙ্গ দিল।

পশুসেনারা রণে ভঙ্গ দিলেও পশুরাজ আবার ব্যাকুল হয়ে যুদ্ধে এল। নখ দিয়ে কালকেতুর দেহ করে দিল ক্ষত-বিক্ষত। রক্তাক্ত হল মহাবীর। পশুরাজকে ধরে কিল মেরে পাঁজর ভেঙে শেষ পর্যন্ত কৃপাবশত তাকে ছেড়ে দিল কালকেতু। পরাজিত পশুরাজকে দেখা গেল—

সিংহ পালাইয়া যায় ঘন পাছুপানে যায়
ত্রাসে সিংহ পান করে নীর॥[৭]

পরবর্তীতে সিংহ তার জবানীতে বলেছে দেবী চণ্ডীর বাহন বলে বীর কালকেতু তাকে বধ করেনি মাত্র। পালিয়ে এসে তৃষ্ণা নিবারণ করে যেন তার পুনর্জন্ম হয়েছে।

যুদ্ধে ব্যাধনন্দনের কাছে পশুরাজ পরাজিত হয়ে ফিরে আসে এবং অন্যান্য পশুরাও রণে ভঙ্গ দেয়। বিপর্যস্ত ত্রস্ত পরাজিত পশুদের এখন একমাত্র আশ্রয়স্থল দেবী অভয়া। পরাজিত পশুরাজ ও অন্যান্য পশুরা প্রবল আর্তিতে দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হলে বোঝা যায় তিনি আদৌ পশুকুলেরই দেবী। ধ্যানযোগে পশুদের ক্রন্দনধ্বনি শুনে তিনি অতি দ্রুত বিজুবনে উপস্থিত হন। আধুনিক সমালোচক জানিয়েছেন— "চণ্ডীর বাইরের রূপটি আর্য-সংস্কৃতির ভাবনার দ্বারা পরিশুদ্ধ হলেও তিনি যে মূলত অনার্য অরণ্যদেবী তা এখানে অপ্রকাশিত থাকেনি।"[৮]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'পশুগণের ক্রন্দন' থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটু অংশ তুলে ধরা হল—

কান্দে সিংহ আদি পশু সোঙরি অভয়া।
অপরাধ বিনে কেনে দূর কৈলে দয়া॥
ভালে টীকা দিয়া মাগো করিলে মৃগরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ॥[৯]

মৃগরাজ তথা সিংহের এই উক্তি দেবীর অরণ্য পশু-রক্ষয়িত্রীর স্বরূপটিকে তুলে ধরে। পাশাপাশি এই আর্ত ক্রন্দন পরোক্ষে প্রমাণ করে কালকেতুর অতুলনীয় বীরত্ব ও শক্তিমত্তাকে। তিনি যে প্রকারান্তে শিকার-সাফল্যের দেবী তার সাক্ষ্য মিলেছে চণ্ডীর চরণে প্রণাম করে কালকেতুর প্রথম যুদ্ধযাত্রায়।

একে কবির কাব্য-রূপায়নের অভিনব কৌশল বলতে পারি। পশুর উপর মানবতা আরোপ, পশুর যুদ্ধ ও কবির ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ অংশটিকে আলাদা মাত্রা দান করে। মনে হয় মুকুন্দ বেশ সচেতন ভাবেই ব্যাপারটিকে সাজিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতার টুকরো ঘটনা দিয়ে। নিজস্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে তিনি ব্যবহার করেছেন পশুদের রূপকে। এককালে তিনিও বলদর্পী শাসককুল দ্বারা উপদ্রুত হয়েছিলেন। শান্ত নিরুপদ্রব জীবন ছেড়ে তাঁকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল অন্য দেশে। অনেকের মতো তাঁর কাছেও বিস্ময় ডেকে এনেছিল মুঘল শাসক ও সৈনিকদের হঠাৎ অত্যাচার। নিজের এই বিপর্যস্ত জীবনের সঙ্গে ঘটনার তাৎপর্য বোধহয় কবির কল্পনার গভীর স্তরে ঐক্য গড়েছিল। তাঁর মতো সাধারণ মানুষ কেন এই বিপদের সম্মুখীন, এ প্রশ্নের জবাব সেদিন কারো জানা ছিল না। পশুরাজ যুদ্ধে পরাজিত হলে বনের মধ্যে বিপন্ন ভালুকের কাতরোক্তিতে আমরা যেন এই মনোভাবেরই আভাস পাচ্ছি। কাঁদতে কাঁদতে ভালুক বলছে—

উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক॥[১০]

পুত্রকন্যা ও স্ত্রীর মৃত্যুতে শজারু যে ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করেছে তা সত্যই হৃদয়স্পর্শী। একজন হৃতসর্বস্ব মানুষের কণ্ঠস্বর এখানে যেন বেজে উঠেছে—

চারি পুত্র মৈল মোর মৈল চারি ঝি।
মাগু মৈল বুড়াকালে জীয়া কাজ কি॥[১১]

বরাহ অশ্রুপূর্ণ চোখে নিবেদন করছে তার স্বজন হারানোর ব্যথা। জীবনের সব হারিয়ে তার কাতরোক্তি—

শাশুড়ী ননদ মরে দেওর ভাসুর।
পতি গেল রতিসুখ বিধি কৈল দূর॥
ছিল মাত্র অভাগীর কোলে এক পো।
পাশরিতে নারিগো তাহার মায়া মো॥[১২]

পশুরা বনের মধ্যে অহিংসভাবে জীবনযাপন করত। বরাহের কথায় সেটা বেশ বোঝা যায়। তারা কারো হিংসা করত না। তাদের এই কাতর ক্রন্দন যেমন মমত্ববোধকে তুলে ধরে তেমনি প্রকাশ করে অত্যাচারী কালকেতুর হত্যালীলাকে। বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত যথার্থই লিখেছেন— "কবি বনমধ্যে কালকেতুর দ্বারা বিপর্যস্ত নানা প্রাণীর যে ছবি এঁকেছেন তা আসলে শক্তিমানের অত্যাচারে পীড়িত মানুষের বিবরণ।.... কবি দামুন্যার সেই মাৎস্যন্যায়ের স্মৃতি ভোলেননি, সর্বত্র দরিদ্র দুর্বলের পীড়ন দেখে নিজ অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন।"[১৩]

দরিদ্র ব্যাধকে অনুগ্রহপুষ্ট করে তুলতে গেলে চাই তার অমিত শক্তি ও বীর্যবত্তা। এরই দাপটে বনের পশুরা শরণ নিতে বাধ্য হয়েছিল অভয়ার। আর দেবী ছলনা-জালে বন্দী করে বরদানে বাধিত করেছিলেন কালকেতুকে। বীরত্ব তাই হয়ে ওঠে ব্যাধনন্দনের আদি ও অকৃত্রিম স্বভাবলক্ষণ।

বাঘ ও কালকেতুর যুদ্ধ

কালকেতু দেবীর কৃপায় গুজরাটের অধিপতি হতে যাচ্ছেন। বেরুণিয়াগণ জঙ্গল কেটে নগর পত্তন করতে গেলে বাঘের মুখে পড়ে কেউ কেউ। প্রাণরক্ষায় তৎপর বেরুণিয়ারা কালকেতুর কাছে বাঘের নামে নালিশ জানালে কালকেতু যুদ্ধযাত্রা করে। মাটি আচঁড়ে বাঘ পথ আগলে থাকে। কালকেতু বাণ ছুঁড়লে বাঘ তা দাঁতে চিবায় এবং লাফ দিয়ে কালকেতুর ধনুক ধরে। আর কালকেতুকে দেখি—

বজ্র মুটকি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত পরে তার তুণ্ডে॥
মুটকির তেজ যেন তবকের গুলি।
এক ঘায়ে ভাঙিলেক বাঘার মাথার খুলি॥
মুটকি খাইয়া বাঘা পুনরপি ধায়।
বজ্র চাপড় মারে মহাবীরের গায়॥
পাছু হইয়া বীর জুড়িল কৃপাণ।
সেই ঘায়ে বাঘারে করিলা দুইখান॥[১৪]

দেখা যাচ্ছে, কালকেতুকে দেখে বাঘ ভয় পায় না। কালকেতু বজ্র মুটকি বাঘের মাথায় মারলে তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে। বাঘের মাথার খুলি ভেঙে যায় সেই আঘাতে। তারপর কৃপাণ দিয়ে বাঘাকে দুই খণ্ড করে কালকেতু।

কালকেতু বীর এবং শিক্ষাসংস্কারহীন বর্বর। এই বর্বরতা তার বীরত্বেরও বিশেষণ। কালকেতুর যুদ্ধজয় প্রায়ই অস্ত্রপ্রয়োগের নৈপুণ্যের অপেক্ষা রাখেনি। মুষ্ট্যাঘাতে সিংহ-ব্যাঘ্রকে পরাজিত ও নিহত করাতেই তার কৃতিত্ব। প্রসঙ্গত বলি, কলিঙ্গসেনার সঙ্গেও সে দীর্ঘ সময় সশস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকেনি। ধনুঃশর পরিত্যাগ করে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় মুষ্টিবদ্ধ হাতে। আসলে সে কুশলী সেনানায়ক নয়, অমানুষিক দৈহিক শক্তির অধিকারী এক মল্লযোদ্ধা। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের বক্তব্য এই খানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"পশুসুলভ এই যুদ্ধরীতি অথবা ভোজনবাহুল্য তার চিত্তবৃত্তির আদিম ও অপরিণত গঠনেরই পরিচয় দেয়।"[১৫]

এখানে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছে নগর পত্তন করতে। বনকর্তন হলে পশুরা যাবে কোথায়? তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হবার মুখে পড়বে। কালকেতু নতুন নগরী তৈরি করতে চায়, আর বন্য শ্বাপদ নিজের বাসভূমিকে হাতছাড়া করতে চায় না। এ-থেকেই তো জীবন-মরণের লড়াই।

কলিঙ্গরাজ ও কালকেতুর যুদ্ধ

এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটটি কবিরা রচনা করেছেন এই ভাবে—দেবীর কৃপায় কালকেতু বন কেটে নগর পত্তন করলে পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গরাজ্য থেকে অসংখ্য দুর্গত প্রজা কালকেতুর রাজ্যে আসে। তাদের সঙ্গে সুযোগসন্ধানী ধূর্ত ভাঁড়ু দত্তও গুজরাট রাজ্যে আশ্রয় পেয়ে যায়। স্তাবকতা করে সে লাভ করে মণ্ডলীর পদ এবং সুযোগ বুঝে অত্যাচার শুরু করে হাটুরিয়াদের উপর। পীড়িতদের অভিযোগে রাজা কালকেতু ভাঁড়ু দত্তকে মণ্ডলী-পদ থেকে অপসারিত করে। মণ্ডলীর পদ থেকে বিতাড়িত ভাঁড়ু চরম ক্রোধে কালকেতুর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য পূর্বের রাজ্য কলিঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হল। অনার্য কালকেতুর কাছে অপমানিত ভাঁড়ু কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করে তোলে কালকেতুর বিরুদ্ধে । সেখানে কলিঙ্গরাজের সার্বভৌমত্বের প্রসঙ্গ তুলে আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে কলিঙ্গের অন্তর্গত গুজরাটের বনে একজন ব্যাধের রাজা হবার সংবাদ জ্ঞাপন করল।

এ-কথা শুনে কলিঙ্গরাজ কোটালের প্রতি রুষ্ট হয়ে ঐ রাজ্যের সংবাদ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। কোটাল রাত্রির অন্ধকারে গুজরাট পরিভ্রমণ করে সেখানকার সুখ-ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবনযাত্রা দেখে কলিঙ্গরাজের কাছে সংক্ষেপে জানাল—

বীরের ঐশ্বর্য দেখি অনুমানে আমি লখি
তোমারে না করে ভয় বীর।[১৬]

অতএব কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। স্বার্থান্বেষী ভাঁড়ুর স্বার্থসিদ্ধিতে কালকেতু বাদ সেধেছিল বলেই সে ব্যাধরাজার বিরুদ্ধে কলিঙ্গরাজকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে প্ররোচনা জুগিয়েছিল। গুজরাট নগরের সমৃদ্ধির কথাও জেনেছিল কলিঙ্গরাজ। কালকেতুকে শায়েস্তা করতে কলিঙ্গরাজ কোটালকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দিল। বিশাল সৈন্য-সমাবেশ হল। গজ-অশ্ব-রথ-পদাতিক কিছুই বাকি থাকল না। রণে পাগল রণগাজী সজ্জিত হল। রাজভ্রাতা তিন কোটি সেনা নিয়ে চলল। তাদের মাথায় টোপর, কটিতে কিঙ্কিণী। কলিঙ্গরাজ এভাবে কালকেতুর বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করলে কালকেতু যুদ্ধে অগ্রসর হল। কলিঙ্গ সৈন্যদের দেখা গেল—

চতুরঙ্গ দল ধায় ধূলাতে গগন ছায়
দেখিতে না পায় দীননাথ।[১৭]

শত শত মত্ত হাতির শুঁড়ে লোহার মুদগর বাঁধল সেনাপতি। হাতির পিঠে শেল শর খাণ্ডা জাঠা নিল মাহুত। সারি দিয়ে চলল ঘোড়ার রথ। তাতে এক একটা মহারথী বসে। মাথায় জালের দড়ি বেঁধে শরীরে রাঙা মাটি মেখে তিন কাহন কোলসৈন্য চলল। হাতে তাদের তিরকাঠি। এরপর রায়বেঁশে সৈন্য। চারিদিক রণদামামা বাজছে। আর সৈন্যদের হাতে দেখা যাচ্ছে ভিন্দিপাল, তবক, বেলক, ভূষণ্ডী, ডাবুশের মতো অস্ত্র।

চরমুখে সংবাদ পেয়ে কালকেতু রণসজ্জায় সজ্জিত হল। তার কথা—বীরবংশে জন্ম রাজারে দিব রণ।[১৮] আত্মরক্ষার্থে সে পরিধান করল অভেদ বর্ম, মাথায় পরল সোনার টোপর। চোয়াড় সৈন্যরা নিল চিয়াড়, করবাল, ভূষণ্ডী, টাবুসের মতো অস্ত্র। তাদের কেউ ধুলো-মাটি মেখে সানাই ঢোল দুন্দুভি শিঙা বাজাচ্ছে, কেউ উরুতে ঢাল বাঁধছে। কালকেতুর আক্রমণে কলিঙ্গসৈন্য দিশেহারা। আমরা যুদ্ধ-বর্ণনায় দেখি—

ক। গালাগালি পাইকে পাইকে শর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
কুঞ্জরে কুঞ্জরে চোপাচুপি।[১৯]

খ। শর লাগে যার গায়ে পড়ে মূর্চ্ছিত হয়ে
বুকে লাগি পৃষ্ঠে হয়ে পার॥[২০]

হাতির শুঁড়ে লোহার মুদগর দেখে ক্ষিপ্ত কালকেতু মুটকি মারল হাতির মাথায়। আর ঘোড়ার পা ধরে মাথার উপর তুলে তাকে মাটিতে ফেলল। ইতিপূর্বে দেখেছি মহাবীর বজ্রমুষ্টি দিয়ে ব্যাঘ্র-নিধন করেছে, টাঙ্গি দিয়ে হাতির শুঁড় কেটেছে, শৈশবে তাড়িয়ে গণ্ডার হরিণ ধরেছে। কাজেই সে তো বীরের মতো যুদ্ধ করবেই। কালকেতুর বিক্রম দেখে কলিঙ্গসেনা রণে ভঙ্গ দিল। এ যুদ্ধে জয়ী কালকেতু। একজন সমালোচক এ-প্রসঙ্গে লিখছেন— ''কবি যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধের বর্ণনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে আরড়াতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জন্মে থাকতে পারে।''[২১]

কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ এখানেই শেষ হয়নি। দেবীর অনুগৃহীত কালকেতুর প্রবল পরাক্রমে কলিঙ্গের সৈন্য পশ্চাদ অপসরণে বাধ্য হয়। রাজসৈন্যের পরাজয় ধূর্ত ভাঁড়ুর দুশ্চিন্তা জাগিয়ে তোলে। কৌশলী ভাঁড়ু ভগ্ন মনোরথ কোটালকে যুদ্ধে পুনর্নিয়োজিত করার জন্য ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ তুলে বলে—

এক লক্ষ টাকা তুমি খাইলে যে ধুতি।
ভাঁড়ু দত্ত জীতে পালাইয়া যাবে কতি॥[২২]

পরিণামে ত্রস্ত কোটাল পুনরায় গুজরাট আক্রমণ করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (প্রথম ভাগ) সম্পাদনা কালে ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন— "মুকুন্দরামের কাব্যে ভাঁড়ু কলিঙ্গরাজের সৈন্যদলে থাকিয়া কোটালকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছে ও কোটাল যখন রণে ভঙ্গ দিতে উদ্যত তখন তাহাকে ভয় দেখাইয়া পুনরায় যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য করিয়াছে। ভাঁড়ুর এই বৈরনির্যাতন-স্পৃহা এক চমৎকার রণনীতির ন্যায় ফলপ্রসূ হইয়াছে।"[২৩]

কালকেতু কলিঙ্গরাজ-সৈন্যদের প্রথমে পরাজিত করেছিল। দ্বিতীয় বার যুদ্ধে অগ্রসর হবার প্রাক্কালে ফুল্লরা স্বামীকে নানা যুক্তি দেখিয়ে মানা করেছিল যুদ্ধে যেতে। এক অজ্ঞাত বিপদ আশঙ্কা করে ব্যাধ-রমণী বলছে—

প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।
হারিয়া যে জন যায় পুনরপি আইসে তায়
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ॥
যদি আছে জীয়ে আশা ত্যজিয়া দেশের বাসা
প্রাণ লয়ে চল মহাবীর।[২৪]

ফুল্লরার পরামর্শে মহাবীর লুকিয়েছিল ধান্য ঘরে। বনে সে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে ও অপরিমিত শক্তির অধিকারী, কিন্তু সত্যিকারের ক্ষাত্র সংস্কার ও বীরত্বের অভিমান এখানে অনুপস্থিত। এদিকে বীরের সাড়া না পেয়ে ভাঁড়ু চাতুর্য অবলম্বন করে অভিনয় কুশলতার সাহায্যে সরলমনা ফুল্লরার কাছ থেকে জেনে নেয় লুক্কায়িত কালকেতুর অবস্থান। এই খানে সমালোচকের মন্তব্য বিশেষ প্রাসঙ্গিক— "আপন বুদ্ধির সামান্যতার জন্যই আত্মবিশ্বাস নেই, তাই যুদ্ধজয়ের পরেই ধান্যশালায় পলায়ন, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ব্যাধজীবনের অরণ্য-পরিবেশে সে জীবন্ত, কিন্তু রাজ্যপরিচালনার বুদ্ধি ও মেধাপ্রধান বৃত্তিতে সে ম্রিয়মান।"[২৫]

কলিঙ্গ শিবিরে ভাঁড়ুর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই কোটাল সদম্ভে আক্রমণ করল বীরের গড়। যুদ্ধের ভেরিবাদ্যে কালকেতু আর নিজেকে সংবৃত রাখতে পারেনি। শুরু হল বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে মহারণ। কালকেতুকে একাকী বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে দেখা গেল—

ধরিয়া বীর রণে তুরঙ্গ চরণে
মাথাতে তুলিয়া দিল নাড়া।
রঙ্গ ছাড়িল তুরঙ্গ পড়িল
হাতেতে রহিল ফড়া॥
করিবর শুণ্ডে ধরিয়া মুণ্ডে
মুটকি মারিয়া দিল টান।
ছিণ্ডিল শুণ্ড ভাঙ্গিল মুণ্ড
কাঁকড়ি যেন খান খান॥[২৬]

যে মুহূর্তে কালকেতুর জয় অবশ্যম্ভাবী, ঠিক সেই মুহূর্তে দেবতার কৌশলে হৃতবল হল অমিত-পরাক্রমী কালকেতু। দেবী চণ্ডী পুজো প্রচারের কারণেই বীরের সমস্ত শক্তি হরণ করে নেন এবং কালকেতুর পরাজয় নিশ্চিত করেন। তার প্রতাপ দৈবী ইচ্ছায় নিশ্চিহ্ন হলে কোটালের হাতে সহজেই বন্দী হল কালকেতু। মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে ইন্দ্রজিতকে উদ্দেশ্য করে লক্ষ্মণ বলেছিল 'মারি অরি, পারি যে কৌশলে'।[২৭] লক্ষ্মণ নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে বধ করেছিল নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে। ভাঁড়ু দত্তের কৌশলে প্রায় নিরস্ত্র কালকেতুকে কোটাল বন্দী করল ধান্যঘর থেকে। দেখা গেল—

চতুরঙ্গ দলেতে কোটাল বীরে বেড়ে।
সৈন্যের ঠেলাঠেলি বীর ভূমে পড়ে॥[২৮]

দ্বিজ মাধবের কাব্যে চার লক্ষ কলিঙ্গসেনাকে কালকেতুর নগর অবরোধ করতে দেখা যায়। পূর্ব-দ্বারের দায়িত্বে জনার্দন, পশ্চিমে রাজভ্রাতা শুভঙ্কর, উত্তরে কালুদণ্ড এবং দক্ষিণে দেবাই। কালকেতুর বন্দী-দশা সম্পর্কে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন—

গজের শিকলি দিয়া বান্ধে মহাবীর।
হাতে বাঘ-হাতা দিল গলাতে জিঞ্জির॥[২৯]

এই একবারই আমরা কালকেতুকে বীর্যহীন দেখলাম। মঙ্গলকাব্যের প্রথা মেনে আরো একবার পরাজয় ঘটল মনুষ্যশক্তির তথা মানবত্বের।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যাধ খণ্ডের নায়কের এই পরাজয় আমাদের মনে ট্র্যাজিডি বোধকে জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট। আসলে যে মানুষটি প্রথমাবধি আপন শক্তির দম্ভে ও মহিমায় আমাদের মনে নায়কত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত তার হঠাৎ এ-হেন পরিণাম সুস্থ কাব্যবোধের ক্ষেত্রে কিছুটা বিপর্যয় সৃষ্টি করে। একে আমরা নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত মন্দভাগ্য ছাড়া আর কিবা বলতে পারি। এ পরাজয় মঙ্গলকাব্যের ট্র্যাডিশনকে অক্ষুণ্ণ রাখলেও কাব্যরসপিপাসু বোদ্ধা পাঠকের মনে গড়ে ওঠা বিশেষ রসপ্রতিমাকে মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে আকস্মিক রসাভাসের আঘাতে।

আধুনিক পাঠক সমালোচকেরা মধ্যযুগের কাব্যে দৈবীপ্রভাব সম্পর্কে যে অভিযোগ তোলেন তার একটি বাস্তব ভিত্তি আছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবতা ও মানুষের পাশাপাশি উল্লেখ থাকলেও দেবতাই প্রভাব বিস্তার করেছে মানুষের উপর। দৈবের অঙ্গুলিহেলনে সেখানে সবই সম্ভব হয়েছে। উদ্ধত মানুষের মাথা এসে ঠেকেছে ক্রুদ্ধ দেবতার চরণে। সামন্ততন্ত্রের ঘেরাটোপে ধর্মের সংস্কারাচ্ছন্নতায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই চাপা পড়েছিল সেদিন। বণিক সমাজের মাথারা শুধু নয়, এর থেকে রেহাই পায়নি অমিতবিক্রম কালকেতুও। জীবনের প্রথম পর্বে নিষ্ঠুর দারিদ্র্য আর বন্য পশুর হিংস্রতাকে সে পরাজিত করেছিল প্রচণ্ড শক্তিমত্তা দিয়ে। অভাবমোচনের জন্য সে কোনো দিন দৈবকৃপার প্রার্থী ছিল না। তার অস্বাভাবিক ভোজনে সাধারণের মনে ভয় কৌতুক ও বিস্ময় জাগলেও আসলে সেটা ছিল হিংস্র বলশালী বন্যপশুর সঙ্গে লড়াইয়ে নিজেকে প্রস্তুত করার প্রাথমিক ধাপ। একজন অতি সাধারণ মানুষের ভাগ্যকে মেনে নেবার দৃঢ় মানসিকতা ও মানবসুলভ পৌরুষের পরিচয় এ-সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা পেয়ে যাই। কিন্তু যখনই সে দৈবকৃপার অধীন হল তখনই তার শুরু হল জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। অতি নগণ্য ব্যাধ হল প্রতাপশালী রাজা, আত্মবশ মানুষ হল দৈবাধীন পুত্তলিকা। লক্ষণীয়, সমগ্র কাহিনির মধ্যে অমিতবীর্য কালকেতু একবারই পরাজিত হয়েছে এবং তা দেবী চণ্ডীর ইচ্ছায়। দেবীর উদ্দেশ্য ছিল ত্রিলোক-বিস্তারী মাহাত্ম্য ও মর্ত্যে পূজাপ্রচার। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে অনুগত ভক্তকে আকস্মিক বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করে সেই সুযোগটিই তৈরি করেন দেবী।

সর্বোপরি এই যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্যে আমরা সমকালীন যুদ্ধযাত্রার একটা আবহ খুঁজে পাচ্ছি। যুদ্ধকে কিছুটা অতিরঞ্জিত করে কবিরা অলৌকিকতার আমদানি করেছেন ক্ষেত্রবিশেষে একথাও সত্যি। তবে সাহিত্যে একটু অতিরঞ্জন বেমানান নয়। কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয় করেছেন চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা। বাস্তবতার দাবি এখানে একেবারে উপেক্ষিত হয়নি। সৈন্যসমাবেশে, যুদ্ধের গতিছন্দে, সংঘর্ষের বাস্তব অভিঘাতে, হাতি-ঘোড়া-পাইক-মাহুত-রণবাদ্যের সমাবেশে, আত্মশ্লাঘা-আস্ফালন প্রভৃতি যুদ্ধসজ্জার যান্ত্রিক ও মানসিক উপকরণ-বাহুল্যে কবিরা নিজ উত্তেজিত কল্পনা ও বাস্তব অনুভূতির কতকটা পরিচয় দিয়েছেন। গতানুগতিক রীতিতে যুদ্ধের বর্ণনা অনুসরণ করলেও কবিকঙ্কণ মুকুন্দ কোথাও কোথাও যে মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন এ বিষয়ে আমরা স্থির নিশ্চিত। সব মিলিয়ে একটা অস্পষ্ট কোলাহল, দ্রুত সঞ্চারী দৃশ্য-পরিবর্তনের আবছা প্রতিচ্ছবি সৈন্য পদচারণার ধূলিজালে সমাবৃত দিগন্তের ন্যায় আমাদের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে।

সূত্র নির্দেশ:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি, (১৯৯৬), (সম্পা.), *কবি মুকুন্দরাম-বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (প্রথম ভাগ)*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমিকা, পৃ. ৪১।
২. *তদেব*, পৃ. ১৯৫।
৩. *তদেব*, পৃ. ১৯৫।
৪. *তদেব*, পৃ. ১৯৬।
৫. *তদেব*, পৃ. ১৯৭।
৬. *তদেব*, পৃ. ১৯৮।
৭. *তদেব*, পৃ. ২০০।

৮. নস্কর, সনৎকুমার, (২০০৩), (সম্পা.), *মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ-চণ্ডী,* কালকেতু পালা, রত্নাবলী, পৃ. ৪৬১।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি, (১৯৯৬), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২০১।
১০. *তদেব,* পৃ. ২০২।
১১. *তদেব,* পৃ. ২০৫।
১২. *তদেব,* পৃ. ২০৩।
১৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র, (১৪০৪), *কবি মুকুন্দরাম,* গ্রন্থনিলয়, পৃ. ৯৫।
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি, (১৯৯৬), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩০৩-৩০৪।
১৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র, (১৪০৪), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৭৩।
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি, (১৯৯৬), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৮০।
১৭. *তদেব,* পৃ. ৩৮২।
১৮. ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ, (১৯৬৫), (সম্পা.), *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯১।
১৯. *তদেব,* পৃ. ৯২।
২০. *তদেব,* পৃ. ৯৩।
২১. নস্কর, সনৎকুমার, (২০০৩), (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৭৮।
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি, (১৯৯৬), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৯৯।
২৩. *তদেব,* ভূমিকা, পৃ. ৪০।
২৪. *তদেব,* পৃ. ৩৯৯-৪০০।
২৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র, (১৪০৪), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৭৩।
২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও চৌধুরী, বিশ্বপতি, (১৯৯৬), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪০৭।
২৭. গুপ্ত, ক্ষেত্র, (২০০৯), (সম্পা.), *মধুসূদন রচনাবলী,* মেঘনাদবধ কাব্য: ষষ্ঠ সর্গ, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৮৭।
২৮. *তদেব,* পৃ. ৪০৮।
২৯. *তদেব,* পৃ. ৪০৮।